পুবের কলম

পাতাবাহার

‘নিরপেক্ষভাবে দেশের ইতিহাস চর্চা করতে হবে’

ইতিহাস নিয়ে নিরন্তর চর্চা করে চলেছেন তরুণ লেখক মুহাম্মদ আবদুল আলিম। ইতিহাস নিয়ে মানুষের মধ্যে নানান ভুল ধারণার অবসান ঘটাতে চান তিনি। তুলে ধরতে চান প্রকৃত ইতিহাস। তাঁর জীবন ও চর্চা নিয়ে একটি সাক্ষাৎকার ‘পুবের কলম’-এর পাতায়।

লেখক মুহাম্মদ আবদুল আলিমের সাক্ষাৎকার

● **আপনার জন্ম, বেড়ে ওঠা, পড়াশোনা ইত্যাদি নিয়ে কিছু বলুন।**

☞ আমার জন্ম ১৯৯০ সালের ১০ জানুয়ারি, পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের সীমান্তবর্তী বীরভূমের প্রত্যন্ত গ্রাম শালজোড়ে। নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালি কৃষক পরিবারে। আমার পড়াশোনা শুরু গ্রামের প্রাথমিক স্কুলে। লোকপুর হাইস্কুলে উচ্চমাধ্যমিক সমাপ্ত করে ঝাড়খণ্ডে উচ্চশিক্ষার জন্য দুমকার আদিত্য নারায়ণ কলেজ থেকে ভূগোলে অনার্স নিয়ে স্নাতক সমাপ্ত করি। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোলে মাস্টার্স ডিগ্রি করেছি। এরপর কলকাতার ‘ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিউট অফ ফিল্ম অ্যান্ড ফাইন আর্ট’ থেকে স্ক্রিপ্ট রাইটিং ও ফিল্ম ডিরেকশন নিয়ে কোর্স করি।

● **কলকাতায় কী উদ্দেশ্য নিয়ে আসলেন? কী কাজ করছেন?**

☞ কর্মসূত্রেই আমার কলকাতায় আসা। আমার কাজ মূলত লেখালেখি আর বিভিন্ন চলচ্চিত্রে সহকারি পরিচালক হিসাবে কাজ করা।

● **ইতিহাস আপনাকে কেন আকৃষ্ট করল?**

☞ সর্বপ্রথম আমি ইতিহাসের প্রতি আকর্ষিত হই শ্রদ্ধেয় মরহুম গোলাম আহমাদ মোর্তাজা সাহেবের লেখা ইতিহাসগ্রন্থ পড়ে। তিনি নিজে কোনও ঐতিহাসিক ছিলেন না এবং তিনি ইতিহাসের উপর মৌলিক কোনও গ্রন্থ রচনা করেননি। তবে তিনি ইতিহাসের আকরগ্রন্থ ও বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের পর্যালোচনামূলক ইতিহাসগ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন সেসব পড়ে ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হই।

পাঠকদের উদ্দেশ্যে একটি ছোট্ট তালিকা দিতে পারেন— যা পড়ে প্রচলিত ভুল ইতিহাস নিয়ে তাদের ভুল ভাঙবে।

প্রচলিত ভুল ইতিহাস সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করতে হলে শাসকদের উপর লেখা সমকালীন লেখকের জীবনীগ্রন্থ ও শাসকদের নিজস্ব আত্মজীবনী অবশ্যই পড়তে হবে। সেইসব আকর গ্রন্থ পাঠ করলে ইতিহাস সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা দূর হবে। এছাড়াও ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার, বিপানচন্দ্র, রামশরণ শর্মা, রমেশচন্দ্র মজুমদার, ইরফান হাবিব প্রমুখ ইতিহাসবিদদের লেখা গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।

● **ইতিহাস বিকৃতি ঘটছে। এটা রোধ করতে কী ধরনের কাজ করা উচিত বলে আপনার মনে হয়?**

☞ ইতিহাসবিকৃতি রোধ করতে গেলে নিরপেক্ষভাবে ইতিহাসচর্চা করতে হবে। কোনও ধর্ম বা রাজনৈতিক চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ইতিহাসচর্চা করলে হবে না। আমাদের দেশে সব থেকে বিকৃত ইতিহাস পড়ানো হয় বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠকক্ষে অর্থাৎ সিলেবাসের ইতিহাসে। সিলেবাসের ইতিহাসের মতো বিকৃত ইতিহাস কোথাও পড়ানো হয় বলে আমার মনে হয় না। এটা আমরা সকলেই জানি যে, শিক্ষিত সমাজের এক বিরাট অংশের সঙ্গে ইতিহাসের পরিচয় বিদ্যালয়ের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আর সেই সিলেবাসের বিদ্যা সম্বল করেই বেশিরভাগ মানুষ তাঁর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি করেন। ফলে বিকৃত ইতিহাস পাঠ করে সহজেই সরলমনা ছাত্ররা বাল্যকাল থেকেই সাম্প্রদায়িকতার শিক্ষা নেয়। পাঠ্যপুস্তক বা টেক্সট বুক-এর গুরুত্ব অন্য পাঁচটা গবেষণা পুস্তকের চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্য বহন করে।

আসলে আমাদের দেশে যাঁরা ইতিহাসের জন্য সিলেবাস তৈরি করেন, তাঁরা অধিকাংশই বর্ণ সংস্কারে লালিত চরম সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন, পরশ্রীকাতর ও পরধর্ম-বিদ্বেষী। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মতো একজন মহান শাসককে সিলেবাসের ইতিহাসে এখনও খলনায়ক ও হিন্দু-বিদ্বেষী দেখানো হয়। অথচ আধুনিক সমস্ত নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ ভুরি ভুরি প্রমাণ দিয়ে তাঁকে ক্লিনচিট দিয়েছেন যে, তিনি খলনায়ক ও হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন না। আসলে সর্বপ্রথম ব্রিটিশরাই ভারতীয়দের শিখিয়েছে আওরঙ্গজেবের মতো সমস্ত মুসলিম শাসক মাত্রেই হিন্দু-বিদ্বেষী, মূর্তিসংহারক, লুণ্ঠনকারী, প্রজাপীড়ক ছিলেন। ব্রিটিশরা ভারতীয় শান্তশিষ্ট হিন্দুদের এটা বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে, ভারতে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে ভালোই হয়েছে। মুসলিম শাসকদের অত্যাচার থেকে ইংরেজরাই এদেশের অপামর হিন্দু জনগণকে মুক্তি দিয়েছে। ইংরেজরাই ভারতীয় হিন্দুদের মনে সর্বপ্রথম মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে, ভুল ইতিহাস শিক্ষা দিয়েছে। এই ভেজালযুক্ত ইতিহাস প্রচার করেছেন ব্রিটিশদের মদদপুষ্ট কিছু তথাকথিত ভারতীয় ঐতিহাসিক। এই বিকৃত ইতিহাস শুধুমাত্র সঠিক ব্যবস্থা করতে হবে।

● **এই পর্যন্ত কী কী বই লিখেছেন?**

☞ সর্বপ্রথম লিখেছিলাম ‘ইতিহাস বিকৃতির প্রয়াস’ নামে একটি ক্ষুদ্র

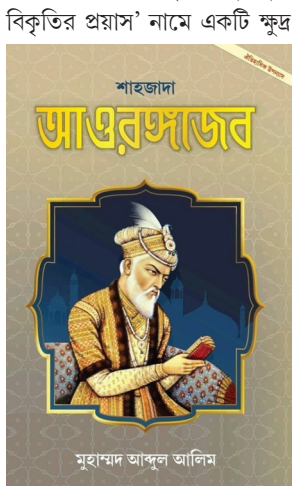

পুস্তক। তবে কলেজ স্ট্রিটে প্রথম প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস হল ‘সিরাজউদ্দৌলা’। নবাব সিরাজউদ্দৌলার জীবনভিত্তিক উপন্যাস। দ্বিতীয় ঐতিহাসিক উপন্যাসটি হল ‘শাহজাদা আওরঙ্গজেব’। তৃতীয়টি হল ‘আকবর: এক ব্যতিক্রমী মুঘল’। এটি উপন্যাস নয়। সম্পূর্ণ ইতিহাসগ্রন্থ। এই গ্রন্থে মুঘল সম্রাট আকবরের সামগ্রিক দিক নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। চতুর্থটি হল ‘বুলবুলি

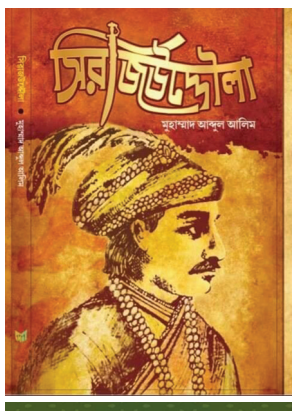

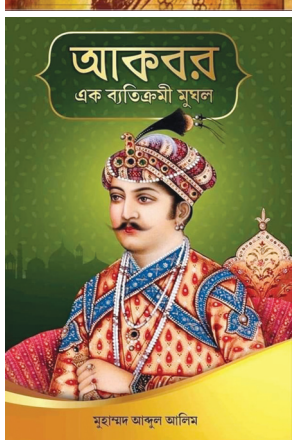

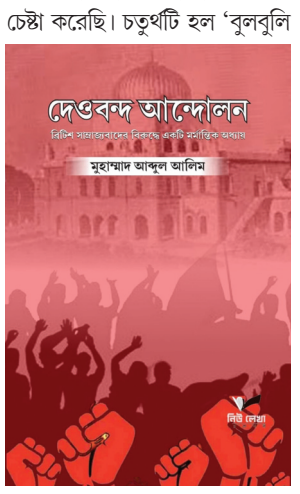

নীরব নার্গিস বনে’। পঞ্চম তথা সর্বশেষ বইটি হল ‘দেওবন্দ আন্দোলন : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি মর্মান্তিক অধ্যায়’। এই গ্রন্থে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উলামায়ে দেওবন্দের কী অবদান তা তুলে ধরা হয়েছে। এটি প্রকাশিত হয়েছে নিউ লেখা প্রকাশনী থেকে।

● **দেওবন্দ নিয়ে বইয়ে কী বলতে চেয়েছেন? নতুন কী উঠে এসেছে?**

☞ স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেওবন্দ আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আমি এই গ্রন্থে দেখানোর চেষ্টা করেছি এই আন্দোলনের কর্ণধাররা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য নিজেদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। এই রক্তমাখা আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল দারুল উলুম দেওবন্দ শিক্ষাকেন্দ্র। ভারতের ইতিহাসে দেশকে ব্রিটিশ বেনিয়াদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য দেওবন্দের কী অবদান তা পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এই বিষয় নিয়ে এপার বাংলায় স্বতন্ত্র কোনও ইতিহাসগ্রন্থ লেখা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এই বইয়ের কিছু অংশ অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থে পেলেও সামগ্রিকভাবে এই গ্রন্থের অনেক তথ্যেই আপনি নতুন পাবেন— যা এর আগে বাংলাভাষী পাঠক অন্য কোনও ইতিহাসের বইয়ে পাননি।

পল্লীকবির পল্লীকথা

ফিরোজা বেগম

কবি জসীমউদ্দীন পল্লীকবি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিলেন ১৯২৭ সালে। গ্রাম-বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে নিসর্গের নানান চিত্র দেখতে দেখতেই তিনি তাঁর কাব্য জগতের পরিধিটাকেও বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন অনেক দূর পর্যন্ত।

কবিতার টান তাঁর মনটাকে সর্বদাই মোহময় করে তুলতো বলেই তিনি ছুটে চলছেন পল্লীর পথে-প্রান্তরে, অরণ্যে এবং নদীর তীরেও। একেবারে শৈশবকাল থেকেই সেই নেশাটাই তাঁকে ভীষণভাবে দুরন্ত করে তুলেছিল। আর সেইসব করতে গিয়েই পড়াশোনায় ফাঁকি দেওয়া স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্কুল ফাঁকি দিয়েছেন তিনি। বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে লিখেছেন অজস্র কবিতা। আপন-মনে সেইসব কবিতা আবৃত্তি করেছেন। অনেক গান গেয়েও মনকে হালকা রাখার চেষ্টা করেছেন।

জসীমউদ্দীনের পিতা ছিলেন তাঁদের গ্রামের মসজিদেরই ইমাম। কাব্যরসে ভরা টইটুম্বুর ছিল তাঁর মনটাও। মুখে মুখে ছড়া রচনা করতে পারতেন তিনিও। বন্ধু-বান্ধবদের চিঠিপত্র লিখতেন কাব্যিক ভাষাতেই।

তাঁর এক দাদুও ছিলেন কাব্যরসিক মানুষ। তিনি অন্ধ ছিলেন বলে লেখাপড়া শেখার কোনও সুযোগই পাননি। কিন্তু তাতে আটকে রাখা যায়নি তাঁর কাব্য প্রতিভাকে। তিনিও মুখে মুখে কবিতা রচনা করতেন। লিখতেন ছোট-বড় অনেক গল্পকথাও। তিনি সবকিছুই লিখতেন আর নাতিকে বলতেন খাতার মধ্যে সেগুলি লিখে রাখতে। ছোট্ট জসীমউদ্দীন তাই করতেন এবং মনে মনে বেশ মজাই পেতেন।

তাই কবি জসীমউদ্দীনের কাব্য-প্রতিভা যে পারিবারিক ধারাতেই প্রবাহমান হয়েছিল— তা স্বীকার করে নিয়েছেন সকলেই।

লেখালেখির ব্যাপারে জসীমউদ্দীন আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন পিতা এবং দাদুকে দেখেই। ছেলেবেলা থেকেই কাগজ আর কলম নিয়ে ছড়া লেখায় মন বসিয়েছিলেন তিনি। তখন গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তখন তিনি কেবল ছড়া-কবিতাই লিখতেন না, নিজের খেয়ালেই অতি গোপনেই যোগ দিয়েছিলেন কবিগানের দলেও।

তাঁর নিজের গ্রামের মধ্যেই ছিল কবিগানের একটা দল। সুযোগ পেলে সেখানেই চলে যেতেন জসীম। সেইসব আসর বসত সাধারণত রাতের দিকেই। তাই সেখানে পৌঁছাতে তাঁকে অনেক ঝুঁকির মুখোমুখিই হতে হত। কিন্তু তবুও তিনি সেখানে যেতেন। প্রথম প্রথম গ্রামের আসরে, তারপর তাঁর দৌড় শুরু হয় পাশাপাশি গ্রামের আসরগুলিতেও।

সব জায়গাতেই মুখে মুখে গান রচনা করতেন তিনি। সুর দিতেন নিজেই। তারপর সেই গান তিনি গাইতেন নিজের গলাতেই। আসরের অন্যান্য কবিয়ালরাও অনেক সময় তাঁর লেখা গানগুলো গাইতেন। তখন একরাশ তৃপ্তির ঢেউ তাঁকে আপ্লুত করে তুলতো। নতুন উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে উঠতেন তিনি। সেই বয়সেই রাত জেগে নতুন নতুন কবিতা লিখতেও শুরু করে দিতেন।

একটা সময় সব খবর পৌঁছে যায় তাঁর পরিবারের কাছেও। সব শুনে সকলেই ভীষণ বিব্রত বোধ করেছিলেন নিশ্চয়ই। কিন্তু তাঁর গতি রোধ করা সত্যিই একটু কঠিন হয়ে উঠেছিল তখন।

তাই ঘটনার জেরে বিষণ্ণ হয়েছিলেন সকলেই। কারণ অত্যন্ত বনেদি পরিবারের ছেলে ছিলেন তিনি। আর সেই বাড়ির একটা ছেলে কবিগানের দলে ঘুরে ঘুরে গান গেয়ে বেড়াক— সেটা কাম্য ছিল না পরিবারের কারও কাছেই। তাইতো তাঁরা জসীমকে ঘরের মধ্যেই বেঁধে রাখার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিল তাঁদের সব প্রচেষ্টাই। থামিয়ে রাখা যায়নি তাঁকে। তিনি তার পরেও কবিতা লিখেছেন, গান গেয়েছেন আবার পরিবারের লোকেদের সন্তুষ্টির জন্য পড়াশোনাও করেছেন। ক্ষেতের শ্রমিক, নৌকার মাঝি, পথের ভিখারী, ভবঘুরের দল অথবা রাখাল বালকদের সঙ্গেও সময় কাটিয়েছেন নিজের মতো করেই।